



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 435 - 441

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নিরঞ্জনের উষ্মা : পাঠে-পাঠান্তরে

ড. শোহিনি ভট্টাচার্য

সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১, পূর্ব বর্ধমান

Email ID : sohiniwb@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025

Selection Date 23. 04. 2025

Keyword

Ramai Pandit,
Shunyapurana,
Mangalkavya,
Niranjaner
Ushma,
Dharmathakur,
Jalali Kalima,
Saddharmi, Islam,
Brahmin,
Bengal's society.

Abstract

Niranjaner Rushma (or Ushma) by Ramai Pandit is an integral part of Shunyapurana. The mythological, historical and social significance of this particular section stands as a cornerstone in the pre-modern Bengali Mangalkavya literature. There is no concrete etymology for the word 'Rushma'. It can happen that while reading or listening, there were some errors in comprehending; Or else there is a possibility that, this new term was strategically coined to imply the fiery wrath of Dharmaraj! In essence, Niranjaner Ushma is a fragment of the 'Jalali Kalima', vividly depicting the Turkic conquest of Jajpur in Odisha. Here, the story unfolds the torture of rapacious Brahmins for honorarium and the exploitation of the common folks which are beyond words. Into this turmoil, Dharmathakur emerged in the disguise of a Yavana who strategically put them in their places and hence justice prevailed.

Many celebrated historians of literature had framed the context of this piece as an era of conflict between Hindu-Buddhist ideologies. And so, in the fading twilight of Buddhism, we witnessed that Brahmanical culture rose to ultimate dominance and tyranny and as an expected outcome, persecuted Buddhists (Saddharmi) dived into the open arms of Islam. This chapter, stained with both power and pain, lingers in the annals of literature as a silent witness. Literature remembers this not as history, but as confession.

Perhaps scholars like Haraprasad Shastri, Nagendranath Basu or Dineshchandra Sen would delve into the political history of 10th–12th century of Bengal and dig up evidence—tracing the rise of royal dynasties (the Sens, Varmans, Chandras, Devas or Khargas). These kings were devoted patrons of Brahminical culture. So, regionally the rise of the Brahmin community as the economic and religious superiors in Bengal's society was the real driving force behind this phenomenon.

Not only West Bengal, esteemed historian of the East Bengal, Ahmed Sharif has also declared 'Bada Jalali & Chhota Jalali' Kalima as a burning evidence of the seething rage and bitter defiance of an near-extinct Buddhist community against the expanding, oppressive Brahminical order. According to the author of "Bangla Sahitya Kosh", Mr. Wakil Ahmed also interpreted that 'Niranjaner Rushma' is nothing but a literary historic instance of the

desperate surrender of the oppressed Buddhists who are trying their best to escape from the pathetic tyranny of Brahmins. In his words, this persecuted community maintained a safe distance and enjoyed the conquest of Turks and the shameful downfall of the Brahmins. As a token of gratitude towards Muslims, they worshipped Niranjana dharma infused with Islamic monotheism. In 'Niranjana Rushma' there is a subtle hint of socio-religious shift where the oppressed Buddhists started to get converted in Islam in a large number.

On the other contrary, historian of Bengali Language, Dr. Sukumar Sen will emphasize that 'Jalali Kalima' is nothing but a reminiscence of the rapid raid of Delhi Emperor Badshah Firoz-Shah-Tughlak in Bengal and Odisha during the 14th centuries.

Moreover, entirely refuting the imagined periodization of Hindu-Buddhist conflicts, Shashibhushan Dasgupta would shift the focus and add: The residues of Buddhism, the framework of Hindu popular thought, certain indigenous non-Aryan ritual practices, and the ethos of Islamic ideology formed into an entirely new tapestry of folk 'Dharma'.

But we'd argue that interpreting this from such scattered, fragmentary angles misses the bigger picture. Take the Ramai Pandit's scripture on Dharma worship rituals (Vishwabharati MS No. 129)—when we piece together the stories before and after 'Niranjana Ushma,' a fascinating narrative unfolds. Here, the Dharma worshippers' belief system describes the cosmic creation process of Dharma-Raja himself, where diverse human races emerge—and right there eventually, the almighty Niranjana (in his form as Khoda) was creating the Muslim community.

Dharmapandit Ramai had replaced Hindu deities like Karticka, Ganesha, Brahma, Vishnu, Maheshwara, Chandi Mata, Manasa etc with Kaji, Gaji, Khoda, Pekambar, Baba Adam, Fakir, Nurbibi etc. This is nothing but Hindu mythological pattern. A hallmark of Hindu mythic tradition is its syncretic impulse—assimilating disparate beliefs by refracting them through the prism of its own deities. In the ecumenical vision of devout seekers, Gods and Goddesses of all faiths converge under one roof; where Khoda, Ishwar, and Dharmathakur had unified into one entity and created this cosmos. In the alchemy of converging divinities, 'Niranjana Ushma' kindles into scripture where all faiths dissolved into a single syllable.

Discussion

রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল 'নিরঞ্জনের রুম্মা' (উম্মা) - যে কাব্যংশের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব প্রাগাধুনিক বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার একটি বহুচর্চিত বিষয়। 'রুম্মা' শব্দটির কোনও তৎসম ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না, শব্দটির পাঠে বা শ্রবণে কিছু প্রমাদ থেকে গেছে; হয়তো ধর্মরাজের উম্মা-জনিত রোষ কল্পনা করেই এই নতুন শব্দটির জন্ম! প্রকৃতপক্ষে, 'নিরঞ্জনের উম্মা' হল 'জালালি কলিমা'-র অংশবিশেষ, তুর্কি-কর্তৃক উড়িষ্যার জাজপুর-বিজয়ের ছবি এতে বর্ণিত। জাজপুরবাসী বেদ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের দল অতিরিক্ত দক্ষিণার দাবীতে সাধারণ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলে সেখানে যবন-রূপী ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব ও কৌশলে তাদের ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করার কাহিনি হলো 'নিরঞ্জনের উম্মা'।

সাহিত্যের প্রথিতযশা ইতিহাসকারেরা অনেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্বিকতার যুগ হিসেবে এর প্রেক্ষাপটকে বিচার করেছেন। ফলত, বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষয়িমুহুর্তের যুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারিত সন্ন্যাসীদের মুসলিমপ্রীতির স্মারক হিসেবেই সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এর অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বা পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন এর কারণ হিসেবে খ্রিষ্টীয় ১০ম-১২দশ শতকের

রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করে হয়তো প্রমাণ করবেন তৎকালীন বাংলার নানান প্রান্তে এমন কিছু রাজবংশের (সেন, বর্মণ, চন্দ্র, দেব বা খড়্গ) আগমনের ইতিবৃত্ত, যাঁরা ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ আঞ্চলিকভাবে বাংলার সমাজে অর্থ ও ধর্মানুশাসক পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানই মূলত এর জন্য দায়ী।

প্রসঙ্গত যেকথা না বললেই নয় - ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’-এর প্রথম সংস্করণকালে চর্যাপদ আবিষ্কৃত না হলেও, শাস্ত্রীমশাইয়ের চর্যা আবিষ্কার-প্রকাশ এমনকি তা নিয়ে তুমুল সাহিত্যিক বিতর্ক ঘটে যাওয়ার পরেও আচার্য সেন তাঁর জীবৎকালে এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে চর্যাপদকে স্বীকৃতি দেন নি; ‘হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ’ অধ্যায়ে চর্যা-বিষয়ে আদ্যন্ত থেকেছেন নিশ্চুপ! ৮০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের প্রেক্ষিতে ক্রমানুসারে শূন্য-পুরাণ, মানিকচাঁদের গান, নাথগীতিকা, কথাসাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনের আলোচনাক্রমে তিনি দেখিয়েছেন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গটি। যাই হোক, এই অধ্যায়েই আচার্য সেনের আলোচনায় ‘নিরঞ্জনের রুখ্মা’ শব্দবন্ধের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই; এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মত -

“শূন্য-পুরাণে একাঙ্গি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। ...‘নিরঞ্জনের রুখ্মা’ শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্তী যোজনা। ... কোন ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হুটু হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।”

শুধু এপার বাংলা নয়, পূর্ববঙ্গীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ মহাশয়ও তাঁর গ্রন্থে ‘বড় জালালী ও ছোট জালালী’ কলিমাকে প্রসারমান প্রবল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতি নিপীড়িত বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘৃণা-ক্ষোভ ও তীব্র বিদ্বেষের নজির হিসেবে বিবেচনা করেছেন -

“বিপ্লবান্তিত্ব বৌদ্ধেরা তাই তুর্কীবিজয়কে ধর্মের তথা তথাগতের আশীর্বাদরূপে জেনে হিন্দুর পরাজয়ে ও দুর্দশায় উল্লাস বোধ করে এবং পরোক্ষ প্রতিশোধবাঞ্ছা চরিতার্থ করে।”

‘বাংলা সাহিত্য-কোষ’ - প্রণেতা শ্রদ্ধেয় ওয়াকিল আহমেদ-এর দৃষ্টিভঙ্গিতেও ‘নিরঞ্জনের রুখ্মা’ হল অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় বৌদ্ধ সদ্ধর্মীদের আশ্রয় নেওয়ার ঐতিহাসিক দলিল। সেন আমলের এই নির্যাতিত নিপীড়িত বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তুর্কির বিজয় ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির পরাজয় দেখে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অক্ষম প্রতিহিংসাপরায়ণের মতো নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত হয়েছিল; মুসলিম-প্রীতিবশতই আরাধ্য দেবতা বর্ণহীন নিরঞ্জন-ধর্মকে তারা ইসলামের আলায়ে একেশ্বরবাদের আদর্শে পূজো করেছে। পরবর্তীকালে দলিত ও অবহেলিত এই বৌদ্ধরাই অধিকহারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, সমাজ পরিবর্তনের সেই ইঙ্গিতটি আমরা ‘নিরঞ্জনের উখ্মা’য় দেখতে পাই। হিন্দুদের পৌরাণিক চরিত্রের বিপরীতে মুসলমান পৌরাণিক-ঐতিহাসিক যেসমস্ত চরিত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছেন রামাই, সাহিত্য-কোষকার তা সযত্নে তুলে এনে দেখিয়েছেন° -

হিন্দু দেবদেবী	মুসলিম চরিত্র
ধর্ম	খোদা (<খুদা, ফা.)
ব্রহ্মা	মহামদ (হজরত মহম্মদ স.)
বিষ্ণু	পেকাঘর (<পয়গম্বর, আ.)
শূলপাণি(শিব)	আদম (আদি পিতা)
গণেশ	কাজী (বিচারক)
কার্তিক	গাজী (মুসলিম ধর্মযোদ্ধা)
মুনি (সাধক ঋষি)	ফকির (ধার্মিক পুরুষ)
নারদ (শিবের অনুচর)	শেক (<শায়খ, আ.; শাস্ত্রজ্ঞানী)

পুরন্দর(ইন্দ্র)	মলনা (মণ্ডলানা, আ.)
চণ্ডিকা	হায়াবিবি (আদি মাতা)
পদ্মা(মনসা)	বিবি নূর (কাল্পনিক মুসলিম নারী)

অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন নিশ্চিতভাবে বলবেন যে ১৪দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা ও উড়িষ্যায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালিয়েছিলেন, তারই স্মৃতি এই ‘জালালি কলিমা’; ধর্মপূজার বিধিবিধান সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্য কিছুটা অন্যরকম -

“শিক্ষিত-সমাজে ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুমান এখন আর সমর্থন করা যায় না। ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সর্ব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে।”^৪

আর হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বান্দ্বিকতার যুগবিভাজন-কল্পনাকে সম্পূর্ণ অসার প্রমাণ করে আরও কিছুটা সরে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলবেন - বৌদ্ধধর্মের লুপ্তবশেষ, হিন্দু লৌকিক চিন্তাধারা, স্থানীয় অনার্য কিছু অনুষ্ঠানরীতি ও ঐসলামিক বিশ্বাসের সমন্বয়েই লৌকিক ‘ধর্ম’-সম্প্রদায়ের জন্ম। এই ধর্ম-উপাসকদের প্রধান আরাধ্য এক এবং অদ্বিতীয় শ্রীধর্মরাজ -

“আসলে সেটা বৌদ্ধধর্মও নয়, প্রচ্ছন্ন হিন্দুধর্মও নয়- সেটি বাঙলা সমাজের শোষণশক্তির ফলে রূপান্তরিত একটি মিশ্র-রঙ এবং মিশ্র-প্রকৃতির নূতন ধর্ম। জনগণের টানা-হেঁচড়ায় পড়ে বুদ্ধদেব কখনও শিবঠাকুরের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছেন- কখনও পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে গলাগলি করে একেবারে একদেহ-একাত্মা হয়ে উঠতে চেয়েছেন; আবার কখনও সেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবঠাকুর একসঙ্গে মিশে গেছেন।”^৫

কিন্তু আমরা বলতে চাই এরূপ বিবিধ আঙ্গিক থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ হল বিচ্ছিন্ন, আংশিক। কারণ ধর্মপূজার বিধিবিধান-সংক্রান্ত রামাই পণ্ডিতের ভণিতায়ুক্ত পুথিটি (বিশ্বভারতী, ১২৯ নম্বর) সম্পাদনা-সূত্রে ‘নিরঞ্জনর উদ্ভা’র পূর্বে ও পরে এমন কিছু গল্প আমরা পাচ্ছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্ম পূজকদের বিশ্বাস মতে বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সামগ্রিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গেই নানান মনুষ্যজাতির জন্ম হয়েছে; সেই সৃজন ক্রিয়াতেই কালচক্রে মুসলমান জাতির জন্ম দিচ্ছেন পরমেশ্বর নিরঞ্জন তথা খোদারূপী ধর্মরাজ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজের এই বিশেষ অংশ তথা ধর্ম সাধকদের চিন্তাভাবনা এইবিষয়ে ইসলামিক-দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। হিন্দু সমাজের এই একাংশের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এইরকম যে, ধর্ম পূজকদের আরাধ্য দেবতাই আসলে অন্যরূপে মুসলমানদের খোদা; সুতরাং অন্যান্য সমস্ত মনুষ্যজাতির মতো মুসলমানরাও শ্রীধর্মরাজের সৃষ্টিপত্তনের ফলে জন্ম নেওয়া এক জাতিবিশেষ। ধর্মপণ্ডিত রামাই এই অংশে যে কাজী, গাজী, খোদা, পেকাম্বর, বাবা আদম, ফকির বা নূরবিবির মতো পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক চরিত্রদের প্রতিস্থাপিত করছেন কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা চণ্ডী-মনসার মতো হিন্দু দেবদেবীদের স্থানে- তা আদতে হিন্দু পৌরাণিক প্যাটার্ন। নিজ ধর্মের দেবদেবীর আদলে এইসব ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টুকরো ধর্মবিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা হিন্দুপুরাণ-কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম সাধকদের এই ঐকতানিক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের দেবদেবীরা এসে পড়েছেন এক ছত্রছায়ায়; আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুর একীভূত হয়ে সৃষ্টি করছেন এই বিশ্বসংসার। সেই প্রসঙ্গেই ‘নিরঞ্জনর উদ্ভা’র পাঠগত অবতারণা।

ধর্মঠাকুরের এই বিশ্বসৃষ্টির কাহিনিটি রামাই বর্ণনা করছেন এইভাবে - সৃষ্টির আদিতে ধর্মঠাকুর ছিলেন অব্যক্ত নিরাকার নিরঞ্জন রূপে। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম আবেগের ফলে সেই শূন্যমূর্তি দ্বিধা হলেন নীল ও অনিল সত্তায়; উভয়ের সম্মিলনে অনাদ্য স্বরূপ ধর্মসাকার রূপে আবির্ভূত হলেন। মহাশূন্যের মধ্যে নিজেকে একাকী দেখে তিনি দুঃখিত হন এবং তখন তাঁর জুস্তগ বা হাই থেকে জন্ম হয় উল্লুকপক্ষীর। তার পিঠে চড়ে তিনি বিশ্বভ্রমণ করতে লাগলেন। বাহন উল্লুক ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত

হয়ে জল চাইলে ধর্মরাজ তাকে যে মুখামুখি দিলেন, তার এককণা বাইরে পড়তেই ব্রহ্মাও হল জলমগ্ন আর ধর্মরাজের একবিন্দু অঙ্গমল সেই জলে ফেলতেই সৃষ্টি হল মেদিনী। এভাবেই বিশ্বচরাচর তথা ত্রিভুবনের সৃষ্টি। তখন ধর্মরাজের কোনও প্রতিশরীর না থাকায় সঙ্গিনীর চিন্তা করলেন তিনি- সেই ইচ্ছাশক্তিবলেই আদ্যাদেবী কেতকার জন্ম হল। উলূকের ঘটকালিতে তাঁদের বিয়ে হল। প্রজাসৃষ্টির মানসে ধর্মরাজ বহ্লুকানদীর তীরে গেলেন তপস্যা করতে আর আদ্যাশক্তির গর্ভসঞ্চারণে হলে যথাকালে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। তাঁরাও জন্মের পর বহ্লুকানদীর তীরে তপস্যায় বসলেন। গলিত ভাসমান শবরূপে ধর্ম এলেন তাঁর পুত্রদের পরীক্ষা নিতে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহকে দ্রুত দূরে ভাসিয়ে দিলেও মহেশ্বর ঠিকই বুঝেছিলেন এ পরমপিতা নিরঞ্জনের ছলনা। তিনি সাদরে সেই শবদেহকে মাথায় তুলে নৃত্য করেছিলেন। এরপরেই তুষ্ট ধর্মরাজ তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করে জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহারের ভার দিলেন। অযোনিসম্ভবা আদ্যাশক্তিকে নখচিহ্ন দিয়ে ভগবিদীর্ণ করে প্রকৃতিস্বরূপা সৃষ্টির আধার করে তুলেছিলেন নিরঞ্জন। সেই আদ্যাশক্তিই কয়েকবার ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে পরবর্তীকালে শিবপত্নী সতীরূপে আবির্ভূত হন এবং রামাই-এর বর্ণনায় শিব ও সতীর মিলনের ফলেই হয়েছিল জগত-সংসারের সৃষ্টি। মাণিক গাঙ্গুলির সৃষ্টিপত্তন মোটামুটি শূন্যপুরাণের মতোই। নাথসাহিত্য অথবা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের আদিকথায় বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এই বর্ণনার বেশ কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

বিশ্বভারতী পুথিশালায় সংরক্ষিত ওই পুথিতে (১২৯ নম্বর) ঠিক এরপরের অংশেই রয়েছে আর একটি গল্প-জাজপুরের অত্যাচারী ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষক পাসা সিংহ বা পাসান সিংহের গল্প। ধর্মঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক পাশাখেলায় পরাস্ত করে পাসান সিংহকে ধর্মান্তরিত করছেন। ধর্মপূজা-বিধানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের ওপর ব্রাহ্মণদের অতিরিক্ত দক্ষিণা-আদায়, জোরাজুরি ও অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকলে ক্রুদ্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠে নিরঞ্জন খোদা-রূপ ধারণ করেন এবং ‘যবন-অবতার’রূপে জাজপুরে উপস্থিত হন। তারপর অভিজাত অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে কৌশলে ধর্মান্তরিত করে শায়েস্তা করছেন ধর্মঠাকুর এই অংশে।

এখন লোকসংস্কৃতির কিছু টুকরো উপাদান আলোচনাসূত্রে আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন রূপে বুঝে নিতে চাইবো এই পাঠান্তরকে, যেখানে শূন্যপুরাণের সৃষ্টি বর্ণনের সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে ‘নিরঞ্জনের উদ্ভা’-প্রথমেই আসি, রাঢ়বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস-সন্ধানী অন্যতম গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক মাণিকলাল সিংহের বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত ‘রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি’ বিষয়ক একটি ছড়ায়। ছড়াটি এইরকম –

“বামনা যবনা ডোমনা/ তিনের পুরাত আপনা আপনা।”^৬

এর পিছনের গল্পে আছে তিন ঋষির গো-মেধযজ্ঞের প্রসঙ্গ; তাঁরা সম্মিলিতভাবে গরুকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে যজ্ঞ করতেন এবং যজ্ঞশেষে মৃত গরুটিকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবন দান করতেন। একসময় এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংসের প্রতি লোভাসক্ত হয়ে একদিন সকলের অলক্ষ্যে একখণ্ড হাড় ও মাংস চুরি করে শালপাতায় মুড়ে সেটি পুকুরের পাঁকে পুঁতে রেখেছিলেন। ফলে যজ্ঞ শেষে যখন গরুটির প্রাণদান করা হল, তখন দেখা গেল গরুটি খুঁড়িয়ে হাঁটছে এবং তার জন্ম বা উন্নতির কিছুটা মাংস নেই। এদিকে ধ্যানযোগে কনিষ্ঠ ঋষি জানতে পারলেন সত্য ঘটনাটি। পুষ্করিণীর পাঁকে ডোবানো শালপাতার মোড়ক খুলতেই দেখা গেল গরুর হাড়টি রসুন এবং মাংসখণ্ডটি পেঁয়াজে পরিণত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ঋষিকে তিনি অভিশাপ দিলেন- ‘তুমি যবন হও’। এরপর তাঁদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল দ্বন্দ্ব-কলহ; ক্রোধের মুহূর্তে কনিষ্ঠ ঋষি অগ্রজের পৈতে টেনে ছিঁড়ে দিতেই তাঁর ক্রোধান্বিতে হলেন অভিশপ্ত- ‘তুমি নীচজাতির মানুষদের যজাইয়া জীবিকা অর্জন করবে’। স্বয়ং ধর্মরাজ এলেন তাঁদের বিবাদ থামাতে। তিন ঋষিকে পৃথক ধর্মের পুরোহিত করে দিলেন তিনিই। দশ দণ্ডী পৈতে দিলেন মেজ ঋষিকে, যিনি হলেন হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এগারো দণ্ডী পৈতে দিলেন কনিষ্ঠ ঋষিকে, যিনি বিশেষভাবে তাম্রধারণ করবেন একমাত্র রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজাধিকারী ডোম-পুরোহিত হিসেবে (ধর্মঠাকুরের পূজা কোনও ব্রাহ্মণ করতে পারবেন না)। আর অভিশপ্ত সেই জ্যেষ্ঠ ঋষি গোমাংস ভক্ষণের লোভের কারণে হলেন যবন। ব্রাহ্মণ, ডোম ও চণ্ডাল এই তিন দলভুক্তির মাধ্যমে উক্ত জাতিবিষয়ক ছড়াটিতে এভাবেই গোমাংসভক্ষণ-এর কারণে যবন-পুরোহিতে পরিণত হওয়ার গল্পটি বর্ণিত হয়েছে।

এখন ‘নিরঞ্জনের উদ্ভা’ সংলগ্ন গল্পটিতে আমরা দেখবো, জাজপুরের নিপীড়ক ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে পাশা খেলার পূর্বে ধর্মরাজের শর্ত মেনে তাঁর গোয়ালের দশটি উন্নতমানের গাভী বাজি রাখতে হয়েছিল। আর কৌশলে তাঁকে পরাস্ত করার পর সেই দশটি গরুর রান্না করা মাংসই পাসানসিংহ ও তাঁর অনুগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে খেতে বাধ্য করেছিলেন ধর্মরাজ। এভাবে গোমাংস ভক্ষণের ফলে ধর্মাস্তর এবং মুসলমান জাতিতে পরিণতির কাহিনি রামাই-এর রচনাতেও ধরা পড়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং ধর্ম ঠাকুরের ছলনায় পড়েই তাঁর ইচ্ছেতে সংসারে সাত-আট প্রজাতির মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্ম হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে- ‘নিরঞ্জনের উদ্ভা’র পূর্ব ও পরবর্তী সপ্রসঙ্গ গল্পপাঠের পর এখনও কি আমরা একে বলবো, এ কাব্যংশ নিছক মুসলমানদের বন্ধু ভাবার গল্প? অথবা, ধর্মঠাকুরের আশ্রয়ে গিয়ে অত্যাচারিত বৌদ্ধ-সদ্ধর্মীদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের কাহিনি? এটি আদতে বিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বর্ণনা, নানান মনুষ্য জাতির জন্ম বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয়ত আমরা উল্লেখ করবো, রাঢ় বাংলার মেদিনীপুর জেলার ঠেকুয়াচকের পটশিল্পী অজিত চিত্রকরের তৈরি একটি পটের গান-

“হাবিল পড়িল শাস্ত্র কাবিল কোরান।

তাহা হতে সৃষ্টি হল হিন্দু-মুসলমান।।”^৭

গানটির ব্যাখ্যায় যে গল্পটি আমরা পাই- হাবিল ও কাবিল দুই ভাই। কোনও কারণবশত তাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হলে হাতাহাতিতে ছোটো ভাই কাবিলের মৃত্যু ঘটে। তখন তার দেহসৎকার নিয়ে চিন্তায় পড়ে হাবিল, কারণ পৃথিবীতে তখনও শবদেহ সৎকারের কোনও উপায় বলা ছিল না। এমন সময় এক জোড়া সংঘর্ষরত কাক তার চোখে পড়লো। তাদের মধ্যে মারামারিতে একটি কাকের মৃত্যু হলে অন্য কাকটি তার ঠোঁটে করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে মরা কাকটিকে শুইয়ে মাটি চাপা দিলো। সেই দেখে হাবিলও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মাটি খুঁড়ে মৃত কাবিলকে কবর দিলো। দুই ভাইয়ের দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত হলে পরমপিতা তাদের একজনকে দিলেন পুরাণ, অন্যজনকে কোরান- সেই থেকেই একজন পেলো দাহ করার অধিকার, অন্যজন কবর। আলোচ্য গানে অজিত পটুয়া বলছেন, পুরাণ-কথা নিয়ে পটের গান বাঁধি আমরা ঠিকই, কিন্তু আমরা আদতে কোরান ধর্মী মানুষ অর্থাৎ ওই বড়ো ভাইয়ের বংশধর। এভাবেই পটুয়া সমাজে এইসব প্রচলিত কাহিনির মধ্যে দিয়ে চলে তাদের সামাজিক অবস্থানকে যুক্তিসিদ্ধ করে নেওয়ার প্রয়াস।

সম্পাদনাসূত্রে প্রাপ্তপুথিটিতেও ‘নিরঞ্জনের উদ্ভা’ সংলগ্ন কাব্যংশে আমরা একটি চাবি-পয়ারকে বারবার আবর্তিত হতে দেখবো- যেখানে ধর্মরাজ ‘হিন্দুকে দিলেন পুরাণ, যবনকে দিলেন কোরান’। রামাই পণ্ডিতের এই রচনার উৎস কোনও নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসজাত চিন্তা ভাবনা তো নয়ই, বরং বলা ভালো বিভিন্ন ধর্মীয় উপকথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই একই কাহিনির সূত্র। একদিকে হাদিসে এই কাহিনির সমর্থন যেমন মিলবে, তেমনি আরও প্রাচীনকালের দিকে চোখ রাখলে আদিপুস্তক বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আদম-ইভের সন্তান হ্যাভেল ও কাইনের গল্প প্রসঙ্গেও এমন কাহিনির অনুষ্ণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এমনকি হাদিস অনুসরণে বাংলাদেশে রচিত বেশ কিছু লোকনাট্যেও হাবিল-কাবিলের পালা হিসেবে গল্পটিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে, যেখানে হিন্দুর পুরাণপ্রাপ্তি ও মুসলমানের কোরান প্রাপ্তির কাহিনি বর্ণিত।

সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলাই যায় যে, রীতিমতো ইসলামিক সংস্কৃতি বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার পর ধর্মমঙ্গলের কাহিনির সূত্রে রামাই-এর এই কাহিনির জন্ম। তা যদি হয়, তবে তো একে কিছুতেই আচার্য সেনের যুক্তি মতো হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে সদ্ধর্মীদের মুসলিম-প্রীতির ঐতিহাসিক আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। ‘নিরঞ্জনের উদ্ভা’ প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব সংসারের সৃজনক্রিয়ায় মুসলমানদেরও মনুষ্যজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির একটি প্রয়াস হিসেবে বিচার্য, যেখানে পক্ষান্তরে ধর্মসাধকদের সৃষ্ট বিবৃতি অনুসারে আরাধ্য খোদা, ঈশ্বর ও ধর্মঠাকুরকে একীভূত করে দেখানোর প্রবণতাই শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিগত ঐক্যে অন্তর্ভুক্তির প্রবণতা থেকেই এমন চিন্তাধারার জন্ম। তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচয় ছিল না এমনটা তো নয়ই, বরং জাতিভেদে খাদ্যগ্রহণের ট্যাবু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল বলেই সনাতন হিন্দুধর্মের গোমৈত্র-যজ্ঞ ও গরুটির পুনর্জীবনদান প্রসঙ্গটিও তাঁরা জানতেন; সেইসূত্রেই গোড়া ব্রাহ্মণ পাসানসিংহকে শায়েস্তা করার জন্য বলপূর্বক গরু খাইয়ে কলেমা পড়িয়ে সুন্নত করানোর মতো গল্পের জন্ম। ফলে, অভিনিবেশপূর্বক পাঠ

করলে বোঝা যায় এহেন ঐকতানিক চিন্তাভাবনা আদতে ধর্মপূজকদের একান্তই নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস- যা মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একত্রে মিলেমিশে থাকার ফলাফল ও অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করতে চাইছে।

পরিশেষে বলা যায়, রামাই পণ্ডিতের ‘নিরঞ্জনের উম্মা’ কাব্যংশের যে ব্যাখ্যা প্রথাগতভাবে চলে এসেছে, তার পুনর্বিবেচনার আশু প্রয়োজন। লক্ষণীয়, এ কাব্যের বাকি অংশে কোথাও কিন্তু খোদার নামোচ্চারণ পর্যন্ত নেই, ধর্মপূজা-সংক্রান্ত আচরণীয় নানান বিধিবিধানই সেখানের মূল আলোচ্য। কাব্যদেহে আধা-সংস্কৃত, আধা-বাংলায় ধর্মপূজার নিয়মাবলীই মূলত বর্ণিত হয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-সহ বাংলা সাহিত্যের সকল স্বনামধন্য ঐতিহাসিকরাই তাঁদের রচনায় ‘নিরঞ্জনের উম্মা’ বলতে পূর্বোক্ত ওই বিশেষ মধ্যবর্তী পাঠ্যাংশটিই রামাই পণ্ডিতের ভণিতাসহ উল্লেখ ও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সপ্রসঙ্গ এর পূর্বের ও পরের গল্প দুটি হয়তো খেয়াল করেননি। এ রচনার একটি শুরুও আছে, শেষও আছে; যা বিচ্ছিন্ন ভাবে পাঠ করা হয়তো যুক্তিযুক্ত নয়। ফলত, পূর্বাপর কাহিনিসূত্র বিচার করে বলা যায় আমাদের আলোচ্য ‘নিরঞ্জনের উম্মা’ কাব্য্যাংশটি মুসলমানদের প্রতি বন্ধুতা বা বৈরিতার আখ্যানমাত্র নয়; অত্যাচারিত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মের ধ্বজাধারী হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ এবং তার পরিণতিতে মুসলমান প্রীতি- এমন সিদ্ধান্তও নিছক বিচ্ছিন্ন কল্পনাজাত মান্যায়ন। আবার একে সমগ্র সদ্ধর্মী সম্প্রদায়ের জীবন ভাবনার পরিচয়বাহীও বলে দেওয়া চলে না। বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্ণীয় গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ভেদযুদ্ধ ও তার ফলাফল এতে আছে একথা সত্য, কিন্তু সেটাই এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয় এমন চিন্তাধারা খণ্ডিত। ধর্মপূজকদের বিশ্বাসদৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজের সমগ্র সৃজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটা খণ্ড বা সৃষ্টির অংশ মুসলমানরা; তাই ধর্ম রাজকর্তৃক সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়ায় মনুষ্যজাতি হিসেবে মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্তির একটা প্রচেষ্টা বরং এখানে খুঁজে পাই আমরা। বিচ্ছিন্ন ভাবে কেবলমাত্র জাতিগত শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিরঞ্জন-ধর্মরাজের উম্মার প্রকাশকে চিহ্নিত না করাই শ্রেয়।

Reference:

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড-৯ম সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৬, পৃ. ৫৪-৫৭
২. শরীফ, আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য [প্রথম খণ্ড], নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ৪৩০
৩. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা সাহিত্য কোষ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯৯
৪. সেন, শ্রীসুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড - সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী), ধর্ম-ঠাকুর-কথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃ. ১১০
৫. দাশগুপ্ত, শ্রীশিভূষণ, বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা, বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা, গোপীমোহন সিংহরায় অনূদিত, ভারবি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ১৫২
৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ২১৭
৭. চট্টোপাধ্যায়, সুমনা দত্ত, পূর্ব ভারতের পটচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ৯